This factsheet has been translated into the local language thanks to the valued support of local NGOs

সার্বিক বিশ্ব-নির্যাতন সূচক স্কোর:

বড়োসড়ো ঝুঁকি

OVERALL GLOBAL TORTURE INDEX SCORE:

HIGH RISK

বিশ্ব নির্যাতন সূচক ২০২৫ হল সেই প্রথম সমীক্ষা, যেখানে ২৬টা দেশে নির্যাতন আর অমানবিক আচরণের ঝুঁকি খতিয়ে দেখা হয়েছে। ভারতের জন্য তৈরি এই বছরের তথ্যপত্রে দেশের সামগ্রিক অবস্থা, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশ্লেষণ, আর নির্যাতন রোধ ও মানবাধিকারের উন্নতির জন্য করণীয় নিয়ে সুপারিশ দেওয়া হয়েছে।

সহযোগী সংগঠন:

পিপলস ওয়াচ

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

ভারতে পুলিশি জেরা, অভিযানে কিংবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে নির্যাতন করা আজ প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় পরিণত হয়েছে। ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক নির্যাতন সূচক জানাচ্ছে, ২০২৩ ও ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী ভারত এখন বড়োসড় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। মারধর, জোর করে স্বীকারোক্তি আদায়, হেফাজতে মৃত্যু প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এর প্রধান শিকার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মানুষ, যেমন দলিত, আদিবাসী, মুসলমান, LGBTQIA+, আর অভিবাসী শ্রমিকরা। পশ্চিমবঙ্গে ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় সাধারণ মানুষ প্রায়ই সহিংসতা, নির্যাতন আর বেআইনি হত্যার শিকার হচ্ছেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে। BSF-কে দেওয়া আইনি ছাড় দোষীদের শাস্তি এড়াতে সহায়তা করছে।

পুলিশের ভেতর গোপন আটক আর বেআইনি হত্যার মতো রীতিগুলো অনেকটা পুরনো নিয়মে চলে এসেছে, আর এমন কাজের জন্য অনেক সময় কর্মকর্তাদের পুরস্কার বা পদোন্নতিও হয়। মানবাধিকার রক্ষাকারীরা নিয়মিত অযৌক্তিক গ্রেপ্তার, আগাম আটক, আর নির্যাতনের মুখে পড়েন, যা এক গভীর প্রাতিষ্ঠানিক সহিংসতার চিত্র তুলে ধরে।

ভারতের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে দেয়। সংবিধানে নির্যাতন নিষিদ্ধ হলেও নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কোনো জাতীয় আইন নেই। একইভাবে, জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কনভেনশন (UNCAT) বা তার ঐচ্ছিক প্রোটোকলেও ভারত এখনো সই করেনি। ২০১৯ সালে UAPA আইন সংশোধন করে সমাজকর্মীদের সহজেই সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করার রাস্তা খুলে দেওয়া হয়, যা ভিন্নমত দমনকে আরও জোরালো করেছে। আবার আন্তর্জাতিক তদারকি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানালেও, বাস্তবে ভারত জাতিসংঘের নির্যাতনবিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধিকে আসতে দেয়নি—যা রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব স্পষ্ট করে।

২০২৪ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ২,৭৩৯ জন হেফাজতে মারা গেছেন, যেখানে ২০২৩ সালে এই সংখ্যা ছিল প্রায় ২,৪০০। এর পাশাপাশি ২০২২ সালে বিচারাধীন অবস্থায় ১,৯৯৫ জন বন্দির মৃত্যু হয়,

যার মধ্যে অন্তত ১৫৯টি মৃত্যু অস্বাভাবিক। ২০১৮ সাল থেকে কমপক্ষে ৬১ জন মানবাধিকারকর্মী UAPA আইনে আটক হয়েছেন। আলোচিত ঘটনার মধ্যে আছে গুরুতর প্রতিবন্ধী অধ্যাপক জি.এন. সাইবাবার দীর্ঘ কারাবাসের পর মৃত্যু এবং সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পানের দুই বছরের কারাবাস—যিনি সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নিয়ে রিপোর্ট করছিলেন।

নির্যাতনের শিকারদের অধিকার কার্যত অস্বচ্ছ। কারা নির্যাতনের ভুক্তভোগী বলে গণ্য হবেন, তার স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীরা প্রতিকার বা পুনর্বাসন পান না। অভিযোগ করার প্রক্রিয়াও অকার্যকর, অনেক সময় অভিযোগকারীর বিরুদ্ধেই পাল্টা হামলা হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থাকলেও, এর স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন আছে এবং ভুক্তভোগীদের জন্য এর পদক্ষেপ প্রায়শই যথেষ্ট নয়।

GENERAL INFORMATION

Type of government: Federal Republic

United Nations Convention Against Torture: Not Ratified

OPCAT ratification: Not Ratified

Population: 1.460.736.310

People deprived of liberty: 573,220

Prison population (per 100,000 of national population): 41

Pre-trial detainees / remand prisoners (percentage of prison population):

75.8%

Documented Detained Human Rights Defenders:

Alerts Issued by the Observatory for Human Rights Defenders in 2024: 11

Prison Occupancy level: 131.4%

Homicide rate (per 100.000 people): 3

বিষয়ভিত্তিক স্তম্ভসমূহের সারসংক্ষেপ

(১) রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা

সূচক স্কোর: পর্যাপ্ত ঝুঁকি

নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অপমানজনক আচরণ (CIDTP) প্রতিরোধে ভারত কোনো কার্যকর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দেখাতে পারেনি। সংবিধানে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও দেশে নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণার জন্য কোনও আলাদা জাতীয় আইন নেই। ভারত এখনো জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কনভেনশন (UNCAT), তার ঐচ্ছিক প্রোটোকল (OPCAT), মৃত্যুদণ্ড বিলোপের জন্য আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক

অধিকার সনদের (ICCPR) দ্বিতীয় ঐচ্ছিক প্রোটোকল বা জোরপূর্বক গায়েব হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের সুরক্ষার আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর করেনি।

২০১৯ সালের জুলাই মাসে সংশোধিত সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ইউএপিএ (UAPA), পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করেছে। এই আইনের মাধ্যমে সরকার মানবাধিকার কর্মীসহ সাধারণ নাগরিকদেরও সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। ২০১৮ সাল থেকে অন্তত ৬১ জন মানবাধিকার রক্ষককে ইউএপিএ বা অন্যান্য নিরাপত্তা আইনে জেলে পাঠানো হয়েছে।

সম্প্রতি, ফৌজদারি আইনে তিনটি নতুন আইন আনা হয়েছে: ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) ২০২৩, যা ভারতীয় দণ্ডবিধিকে প্রতিস্থাপন করেছে, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) ২০২৩, যা ফৌজদারি কার্যবিধির জায়গায় এসেছে, আর ভারতীয় সাক্ষ্য আইন (BSB) ২০২৩, যা আগের সাক্ষ্য আইনকে প্রতিস্থাপন করেছে।

আন্তর্জাতিক তদারকি ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ খুবই সীমিত। সরকার জাতিসংঘের নির্যাতনবিষয়ক বিশেষ দূতকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে সফর ঠেকিয়ে দিয়েছে। গত পাঁচ বছরে দূতের পাঠানো চিঠির অর্ধেকেরও কমের উত্তর দিয়েছে এবং তথ্যও খুব সামান্য দিয়েছে।

(২) পুলিশি নির্যাতন ও প্রাতিষ্ঠানিক সহিংসতা শেষ করা প্রসঙ্গে

সূচক স্কোর: বড়সড়ো ঝুঁকি

ভারতে পুলিশি নির্যাতন ও প্রাতিষ্ঠানিক সহিংসতা ব্যাপক ও প্রশাসনিক পদ্ধতিগত। পুলিশ হেফাজতে মারধর, অত্যাচার, এমনকি বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা বারবার ঘটছে। ডিসেম্বর ২০২০-এ পরমবীর সিং বনাম বালজিৎ সিং মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় থানায় ও তদন্ত সংস্থার অফিসে সিসিটিভি বসানোর। কিন্তু এখনো ২, ৭০১খানা থানায় কোনও ক্যামেরা নেই। যেখানে আছে, বেশিরভাগই নিয়ম মেনে বসানো হয়নি।

হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা প্রায়ই থানায়, হাসপাতালে বা আটককৃতদের স্থানান্তরের সময় ঘটে। পুলিশ স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নিয়মিত মারধর, ভয় দেখানো ইত্যাদি বেআইনি পদ্ধতি ব্যবহার করে। গুলি ব্যবহারের ভুলে অনেক মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটছে, যেগুলো সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে দলিত, আদিবাসী, মুসলিম, LGBTQIA+, পরিযায়ী শ্রমিক আর গৃহহীনদের ওপর। এদের ওপর শারীরিক নির্যাতন, অশোভন দেহতল্লাশি আর বৈষম্যমূলক আচরণ নিত্যদিনের ঘটনা। অনেক সময় পরিত্যক্ত ভবন, সরকারি দফতর, এমনকি হোটেলের ঘরকেও গোপন আটককেন্দ্র বানিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ে মারধর করা হয়।

নতুন আইনে সরকারি কর্মকর্তাদের বিচারের অনুমোদন ১২০ দিনের মধ্যে না দিলে সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মঞ্জুর হবে —এমন নিয়ম আনা হয়েছে। তবে তদন্ত চলাকালে পুলিশের হেফাজতের মেয়াদও অনেকটা বাড়ানো হয়েছে।

এতকিছুর পরেও দায়বদ্ধতা খুবই কম। ২০২৪ সালে ২,৭৩৯ জন ও ২০২৩ সালে প্রায় ২,৪০০ জন হেফাজতে মারা গেছে বলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যায় যুক্ত তথাকথিত ‘এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট’ পুলিশরা পদোন্নতি পাচ্ছে। মানবাধিকার কর্মীরা, বিশেষত জমি বা পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে যারা যুক্ত, তারা প্রায়ই আটক, নির্যাতন ও মিথ্যা মামলার শিকার হচ্ছেন।

(৩) স্বাধীনতা-বঞ্চিত অবস্থায় নির্যাতন থেকে মুক্তি

সূচক স্কোর: বিরাট ঝুঁকি

ভারতে বন্দিদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ভয়াবহ রকমের। শুধু ২০২২ সালেই ১,৯৯৫ জন বন্দি মারা গেছে, যার মধ্যে ১৫৯টি অস্বাভাবিক মৃত্যু। কারাগারে ভয়াবহ ভিড়, গড়ে ধারণক্ষমতার ১৩১.৪% হারে বন্দি রাখা হচ্ছে। দরিদ্র বন্দিরা সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়ছে—যথেষ্ট খাবার, কাপড়, বিছানার অভাবে তাদের অবস্থার আরও অবনতি হচ্ছে।

কারাগারে জাত, ধর্ম, আর্থিক অবস্থা, প্রতিবন্ধকতা ও যৌন পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য স্পষ্ট। এর একটি বড় উদাহরণ অধ্যাপক জি.এন. সাইবাবা—যিনি ৯০% প্রতিবন্ধী ও হুইলচেয়ারে চলাফেরা করতেন—তাকে ২০১৪ সালে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২০১৭ সালে ইউএপিএ-তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও সুযোগ না থাকায় তাঁর শরীর আরও ভেঙে পড়ে।

অভিযোগ জানানোর কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেই। চিকিৎসার রিপোর্ট প্রায়ই কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়া হয় না। নির্যাতনের অভিযোগ থাকা কারারক্ষীরা তদন্ত চলাকালীনও দায়িত্বে থেকে যায়। যারা অভিযোগ করে, তারা বাড়তি তল্লাশি, শাস্তি, একাকী কারাবাস, ভয়ভীতি এমনকি মৃত্যুর মতো প্রতিশোধের মুখে পড়ে।

২০২২ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর হার ৩০০% বেড়েছে। ভারতে ফৌজদারি দায়িত্ব নেওয়ার বয়স মাত্র ৮ বছর। বেসরকারি পর্যবেক্ষকদের জেল পরিদর্শনের তাত্ত্বিক অনুমতি থাকলেও বাস্তবে প্রবেশ প্রায় অসম্ভব, বরং মানবাধিকার কর্মীদের হয়রানি করা হয়।

(৪) দায়মুক্তি

সূচক স্কোর: বড়ো রকমের ঝুঁকি

ভারতে নির্যাতনকারীদের দায়মুক্তি সাংঘাতিক রকমের। নির্যাতন অপরাধ হিসেবে ধরা হয় না—সাধারণত পুলিশ বা বিচার বিভাগীয় হেফাজতে মৃত্যু হিসেবেই নথিভুক্ত হয়। ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষার আইন না থাকায় অভিযোগ জানাতে ভয় পায় মানুষ। ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট কিছু দিকনির্দেশ দিলেও বাস্তবে খুব কম ভুক্তভোগী আইনি সহায়তা পান।

জাতীয় ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ারও সীমিত, বিশেষত সশস্ত্র বাহিনীর অপরাধের ক্ষেত্রে। ২০২৫ সালের মার্চে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশনস (GANHRI) ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মান ‘A’ থেকে ‘B’ করার সুপারিশ করেছে, কারণ তাদের তদন্তে পুলিশ কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এছাড়া নাগরিক স্বাধীনতা সংকুচিত হওয়া, মানবাধিকার রক্ষক ও সাংবাদিকদের উপর আক্রমণও NHRC ঠিকভাবে দেখছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

ভারতে ফরেনসিক তদন্ত ব্যবস্থারও মানদণ্ড নেই। ফলে নির্যাতনের ঘটনার সঠিক প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়। অভিযোগের মামলা সচরাচর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছায় না। উল্টো ভুক্তভোগী, সাক্ষী ও আইনজীবীদের ভয় দেখানো বা কলঙ্কিত করার ঘটনা নিয়মিত ঘটে, আর পুলিশ ও প্রসিকিউটররা অনেক সময় অভিযোগ জানাতে নিরুৎসাহিত করে।

(৫) নির্যাতিতের অধিকার

সূচক স্কোর: উচ্চ ঝুঁকি

ভারতে নির্যাতনের শিকারদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বড় আইনি ফাঁকফোকর রয়েছে এবং যে সুরক্ষাগুলো আছে সেগুলোর প্রয়োগও দুর্বল। এখনো পর্যন্ত নির্যাতনের শিকারদের জন্য আলাদা করে কোনও জাতীয় আইন নেই, কেবল কিছু ছড়ানো-ছিটানো আইনে কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য সীমিত সুরক্ষা রয়েছে। এর ফলে ভুক্তভোগীদের

ন্যায়বিচার ও প্রতিকার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে চেন্নাইয়ের ভিগনেশের কাস্টডিতে মৃত্যু এবং তামিলনাড়ুর চেঙ্গালপাট্টুর এক হোমে এক কিশোরের নৃশংস খুনের কথা বলা যায়। এগুলো দেখায় যে দুর্বল গোষ্ঠীর জন্য যে আইন আছে, সেগুলোও কার্যকরভাবে ব্যবহার হয় না। ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবার বারবার ন্যায্য প্রতিকার চাইতে গিয়ে ব্যর্থ হয়, যা বিচারব্যবস্থা ও জবাবদিহির দুর্বলতাকে প্রকাশ করে। নির্যাতনের শিকারদের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণও খুবই বিরল ও অপর্যাপ্ত—গবেষণায় দেখা গেছে, ০ থেকে ২৫ শতাংশ ভুক্তভোগীই কেবল আর্থিক সাহায্য পান। মানসিক সহায়তা, চিকিৎসা ও পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচারের অভাবে বেশিরভাগ ভুক্তভোগী উপযুক্ত সমর্থন থেকে বঞ্চিত হন।

(৬) সর্ব-সুরক্ষা

সূচক স্কোর: বিরাট মাপের ঝুঁকি

ভারতে দুর্বল গোষ্ঠীগুলোর জন্য সুরক্ষায় বড় ঘাটতি আছে। গত পাঁচ বছরে মহিলাদের ও মেয়েদের উপর তথাকথিত সম্মান রক্ষার নামে খুন বেড়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ ঘটনা প্রকাশই পায় না, কোনও নির্দিষ্ট তথ্যও নেই। যদিও আইন কমিশনের রিপোর্ট নং ২৪২-এ একটি খসড়া আইন প্রস্তাবিত হয়েছিল, এখনো পর্যন্ত এ নিয়ে আলাদা আইন হয়নি। মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে—বিবাহিত ধর্ষণ, গণধর্ষণ, গার্হস্থ্য হিংসা, অ্যাসিড হামলা, এমনকি নগ্ন অবস্থায় রাস্তায় ঘোরানোর মতো অপমানজনক প্রথা চালু আছে। ধর্ষণের মামলায় ভুক্তভোগীদের দোষারোপ করা হয়, বিচারকরা প্রমাণের অযৌক্তিক চাপ দেন, ফলে ন্যায়বিচার পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। জোরপূর্বক বিয়ে ও বাল্যবিবাহও এখনো বহুল প্রচলিত, সরকার সেগুলো দূর করতে তেমন কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছে না। মহিলাদের যৌনাঙ্গ বিকৃতি এখনো চলে, কিন্তু প্রতিরোধে রাষ্ট্রের যথেষ্ট উদ্যোগ নেই। ২০২৩ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধিতে (Bharatiya Nyaya Sanhita) বিবাহিত ধর্ষণকে ধর্ষণ হিসাবে গণ্য করা হয়নি।

শিশুরাও ভয়ঙ্কর শোষণের শিকার। শিশুশ্রম এখনো প্রচলিত, শিশুদের ভিক্ষা, দেহব্যবসা, অঙ্গ পাচার ও বিপজ্জনক কাজে, যেমন আতশবাজি তৈরি বা মৌসুমি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বাধ্য করা হয়। ২০২৪ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, গত ৬ বছরে ভারতে ৯,৬০০-রও বেশি শিশুকে ভুলভাবে প্রাপ্তবয়স্ক কারাগারে বন্দি করা হয়েছে।

ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়, যাদের আইনত "তফসিলি উপজাতি" বলা হয়, তারা প্রায়ই বঞ্চনার শিকার হন, জমি ও সম্পদের প্রশ্নে সংঘাতে জড়ান। খনি, বিদ্যুৎ প্রকল্প ও অবৈধ কার্যকলাপের কারণে তারা বিপদের মুখে পড়েন। মণিপুরে গত প্রায় দুই বছর ধরে জাতিগত হিংসা চলছে, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী ২৬০ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে এবং ৬০,০০০-এর বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তার নামে অভিযুক্তদের জেরা করার সময় প্রায়ই নির্যাতন, মৃত্যু ও অমানবিক আচরণ ঘটে। যেমন, হুইলচেয়ার-নির্ভর ৯০ শতাংশ অক্ষম কর্মী জি.এন. সাইবাবা নাগপুর জেলে ৭ বছর অমানবিক অবস্থায় চিকিৎসাহীন ছিলেন। সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান বর্ণবৈষম্য নিয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে আটক হন। দেশে ১৬৯টিরও বেশি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান থাকলেও আটক কেন্দ্রে কার্যকর নজরদারি প্রায় নেই বললেই চলে, ফলে বহু লঙ্ঘন অপ্রকাশিত থেকে যায়।

(৭) মানবাধিকার রক্ষার অধিকার ও নাগরিক পরিসর

সূচক স্কোর: উচ্চ ঝুঁকি

ভারতবর্ষে সংবিধানে মতপ্রকাশ, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা থাকলেও মানবাধিকার রক্ষাকারী ও সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলো প্রায়ই কঠোর দমন ও ভয় দেখানোর শিকার হয়। বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন (FCRA)

২০১০—বিশেষ করে এর ২০২০ সংশোধনের অপব্যবহারের ফলে ৩০,০০০-এরও বেশি এনজিও কাজ করতে পারছে না। এছাড়া ইউএপিএ, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও বিভিন্ন আটক আইন ব্যবহার করে এনআইএ, সিবিআই-এর মতো সংস্থা নাগরিক স্বাধীনতা দমন করছে। ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার মতো ঘটনার বিচার চাইতে গিয়ে অনেক মানবাধিকার রক্ষাকারী মামলা খেয়েছেন ও জেলে গেছেন।

ভিমা কোরেগাঁও মামলায় কর্মী, আইনজীবী ও গবেষকেরা ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে জেলে আছেন। কাশ্মীরি কর্মী খুররম পারভেজ ৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্দি। জি.এন. সাইবাবা ৮.৫ বছর জেল খাটার পর মুক্তি পান, কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে মারা যান। সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান ২ বছর জেলে ছিলেন, কারণ তিনি হাতরাসে বর্ণভিত্তিক সহিংসতা নিয়ে রিপোর্ট করতে চেয়েছিলেন। কর্মী তিস্তা সেতালভাদ ও অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার শ্রীকুমারও দীর্ঘ বিচারিক হেফাজতে ছিলেন।

কৃষক আন্দোলন, স্টারলাইট-বিরোধী আন্দোলন, ওড়িশার জিন্দাল-বিরোধী আন্দোলন বা মেলমা কৃষক আন্দোলনের মতো জনসমাবেশে নজরদারি করতে গিয়ে কর্মীরা প্রায়ই হয়রানি, মিথ্যা মামলা, ইচ্ছামতো আটক ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই অভিযোগগুলো যথাযথভাবে সামলাতে ব্যর্থ হওয়ায় আন্তর্জাতিকভাবে সমালোচিত হয়েছে।

তথ্যপ্রাপ্তি ও স্বচ্ছতা

গ্লোবাল টর্চার ইনডেক্স প্রতিটি দেশে নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের ঝুঁকি নির্ধারণের সময় তথ্যপ্রাপ্তি ও স্বচ্ছতার অবস্থা বিচার করে। এটি দেখে নাগরিক সংগঠনগুলো কতটা তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং কতটা সহজে তারা সেই তথ্য পায়। প্রতিটি সমাজে আইন ও বাস্তবে তথ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকতে হবে। এর মাধ্যমে সংগঠন, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ সরকারি নথি, নিয়ম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান জানতে পারে। এই সূচকে দেশগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয়—দমনমূলক, গোপনীয়, সীমিত, সহজপ্রাপ্য বা স্বচ্ছ।

ভারতের স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রাপ্তির মান পর্যালোচনা করে তাকে "গোপনীয়" (concealed) হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

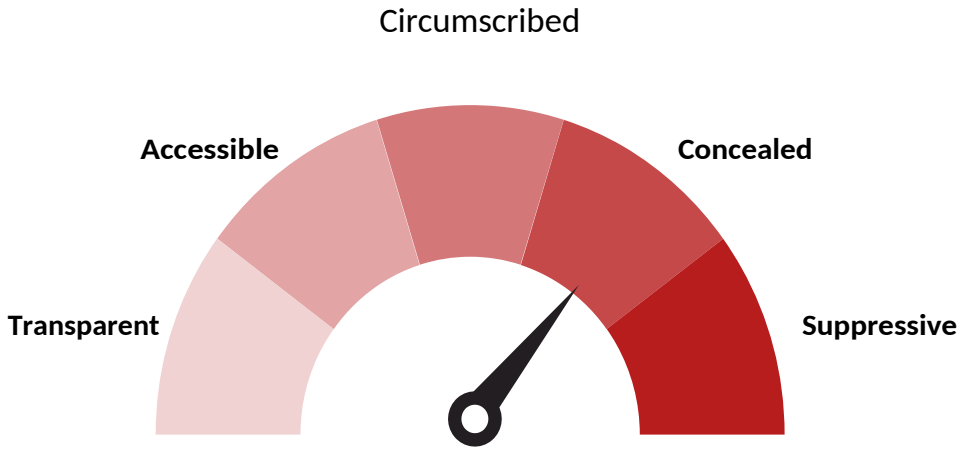

ভারতে পরিবর্তনের দাবি: প্রধান প্রস্তাবনা

এই সূচকে ভারতের জন্য ৫টি সুপারিশ দেওয়া হয়েছে, যা সূচকের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। এগুলো ভবিষ্যতের সংস্করণে রেফারেন্স হিসেবে থাকবে, যাতে নির্যাতনবিরোধী আন্দোলনে কতটা অগ্রগতি হয়েছে তা দেখা যায়।

১. জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কনভেনশন (Convention Against Torture), এর ঐচ্ছিক প্রোটোকল (Optional Protocol), এবং জোরপূর্বক নিখোঁজ হওয়ার বিরুদ্ধে সকলকে সুরক্ষা দেওয়ার কনভেনশনটি অনুমোদন করা।

২. কার্যকর সাক্ষাৎকারের জন্য মেন্দেজ নীতি (Méndez Principles) প্রয়োগ করা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া—যাতে তারা গণসমাবেশ নিয়ন্ত্রণের সময় জাতিসংঘের অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের মৌলিক নীতি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক মান মেনে চলে।

৩. সন্ত্রাসবিরোধী আইন, জাতীয় নিরাপত্তা আইন এবং প্রতিরোধমূলক আটক আইনকে মানবাধিকার রক্ষাকারীদের বিরুদ্ধে অপব্যবহার বন্ধ করা। পাশাপাশি নিশ্চিত করা যে তারা বৈধ ও শান্তিপূর্ণ মানবাধিকার কার্যক্রম চালাতে নিরুৎসাহিত না হয়।

৪. পুলিশ বা বিচার বিভাগীয় হেফাজতে যে কোনো মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিস্তারিত তদন্ত করা, BNSS-এর ধারা ১৯৬ (২) অনুযায়ী, বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে, এবং ইস্তানবুল ও মিনেসোটা প্রোটোকলের নিয়ম মেনে। এ-ও নিশ্চিত করা যে পরিবারের সদস্যরা ময়নাতদন্ত শুরু হওয়ার আগে মরদেহ দেখতে পারবেন এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও ভিডিও একই দিনে পরিবারকে দেওয়া হবে।

৫. মানবাধিকার সুরক্ষা আইন (২০১৯) সংশোধন করা, যাতে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অফ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশনস-এর স্বীকৃতি-সংক্রান্ত উপকমিটির সুপারিশগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা, স্বশাসন ও কার্যকর তদন্তের ক্ষমতা বজায় থাকবে

FURTHER RESOURCES

For further information, the complete 2025 Torture Index—including detailed data visualisations, FAQs, the methodology, and more—can be accessed on our website: https://www.omct.org/en/global-torture-index. Should you have any questions, feel free to reach out to us at tortureindex@omct.org.

ACKNOWLEDGMENT OF SUPPORT

This project is made possible through the generous support of our donors. For a full list of contributors and partners, please visit: https://www.omct.org/en/global-torture-index

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

We invite you to explore the data and share your thoughts on social media using #GlobalTortureIndex. Join us in spreading awareness by engaging with the data and sharing your country's standing to drive meaningful conversation. Your participation is essential in raising awareness and fostering positive change.

CONNECT WITH US ON SOCIAL MEDIA: